অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর ভিনদেশি শিক্ষকেরা

অদ্রিজা রায়

> "...বিশেষ কোনও একটা শিক্ষা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে চালিয়ে নিয়ে গেলেই কাউকে চিত্রবিদ্যার অধিকারী করে তোলা যায় না, ঠিক রাস্তা হচ্চে শিল্পীর মন ও ক্ষমতাকে আপনা আপনি ফুটে উঠতে দেওয়া।...তরুণ চোখ যা দেখলে, সরল মন যা কল্পনা করলে সম্পূর্ণ সহজ ও স্বাধীনভাবে, তারই ছবি টেনে নিয়ে গেল হাত আনন্দে, রঙ তুলি ইত্যাদি নিয়ে খেলতে লাগল ছোট বড় সব শিল্পী যথা ইচ্ছা যথা সুখে- এহলেই তবে শিল্পের মধ্যে স্বাধীন প্রেরণা থাকতে; আর এর উল্টো রাস্তা ধরে গেলে, হয় কোনো বিশেষ শিল্পী বা শিক্ষার ধাঁচ ধরে নকলের দিকেই শিল্পীর মন অজ্ঞাতসারে একটা বিপথে গিয়ে সহজ প্রকাশের ঝর্ণার পথটি চিরকালের মতন হারিয়ে বসবে।"[১]

নিবন্ধের সূচনাতেই প্রায় শতাধিক শব্দের এই উদ্ধৃতিটি পাঠককে কিছুটা ধৈর্যহীন করে ফেলতে পারে, এই আশঙ্কা নিয়েও বলা প্রয়োজন যে, শিল্পের চর্চা তথা শিল্পের শিক্ষা বিষয়ে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূল বক্তব্য কিন্তু এ-ই। আজ যে পদ্ধতি সমস্ত শিক্ষাক্ষেত্রেই ধীরে ধীরে প্রযুক্ত হচ্ছে, তা প্রায় এক শতাব্দী আগে শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সমীচীন বলে মনে করেছিলেন তিনি। শিক্ষা লাভ এবং শিক্ষা দান- বিশেষত শিল্পকলার মতন এমন সংবেদনশীল এক বিদ্যা, এর জন্য দুই পক্ষকেই হতে হয় যথেষ্ট সচেতন এবং স্বতঃস্ফূর্ত। ভারতবর্ষে তথা বঙ্গভূমিতে শিল্পচর্চার ইতিহাস বহু প্রাচীন হলেও শিল্পকলা নিয়ে প্রথাগত শিক্ষালাভের সহজ ব্যবস্থা হয়েছে মাত্র কিছুকাল হল। এই বিষয়ে পথিকৃৎ যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তা উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। আধুনিক ভারতীয় শিল্পস্তম্ভের বুনিয়াদ তিনি নিজে হাতে করে তৈরি করেছিলেন- তা নিয়ে আশা করি ভারতীয় শিল্পের সমঝদার কারও কোনও দ্বিমত আর নেই আজ। তিনি নিজের শিল্পী-জীবনেও পেয়েছিলেন এমনই

বিশেষ কিছু মানুষের সাহচর্য। তাঁর সাহিত্যিক সত্তা তাঁকে কথাশিল্পীর মর্যাদাও দান করেছে সত্য, কিন্তু এই পরিসরে আমরা আলোচনা করতে চাইব শিল্পপিপাসু এক চিত্রকর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে। যিনি প্রথম থেকেই পাশে পেয়েছিলেন এমন কিছু ভিনদেশি মানুষকে, যাঁদের স্পর্শে বাংলার চিত্রশিল্পচর্চার খোলনলচে বদলে গিয়েছিল, অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই। এঁরা জন্মসূত্রে ভারতীয় না হলেও এঁদের মধ্যে বেশিরভাগই পাশ্চাত্যের উদারতার সঙ্গে প্রাচ্যের কলাশিল্পের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকেও একই রকম শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন। ফলে উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধে শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হয়ে ওঠার বুনোটে এঁদের প্রভাব আমরা অনুভব করতে পারি বারবারই। এঁদের মধ্যেই বিশেষ কয়েকজন বিদেশি মানুষকে নিয়ে নিবন্ধের এই পরিসরে আলোচনার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে।

উনিশ শতকের শেষ পর্যায়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন চিত্রকলার চর্চা শুরু করেন তখন বাংলাদেশে তো বটেই, সারা ভারতবর্ষেই ছবি আঁকার ধাঁচ ইয়োরোপীয় কলাশিল্পের অনুসরণে একরকম করে গড়ে উঠেছিল। তার আগে বেশ কয়েক শতাব্দী ধরেই মুঘল রীতিতে ছবি আঁকার ঢংটি এই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ইংরেজ শাসন কায়েম হবার পর পরিস্থিতির বদল ঘটে দ্রুত। গোটা উনিশ শতক ধরেই কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ইয়োরোপিয়ান চিত্রশিল্পীদের আনাগোনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে প্রাথমিকভাবে এই আগমন যতটা স্বর্ণপ্রসূ এক উপনিবেশে ভাগ্য অন্বেষণের উদ্দেশ্যে ঘটে, শিল্পকলার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ততটা হয়তো নয়। কিন্তু ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের সেই সময়ের উৎসাহী সমঝদারদের সঙ্গে মিলেমিশে জন্ম হয় এক নতুন ধরনের ছবি আঁকার প্রকরণের। পোর্ট্রেট, ঐতিহাসিক এবং মজলিশি- এই তিন রকম ছবির আঁকিয়ে হিসেবেই পরিচিতি পান ভিনদেশি চিত্রকরেরা। কোম্পানি শৈলী নামে পরিচিত দেশীয় ও ইয়োরোপিয়ান ধারার মিশেলে আঁকা এইসব ছবি এরপর ক্রমশ জায়গা করে নেয় এই বঙ্গদেশের ধনী মানুষজনের বৈঠকখানায়। কলাকৃতির সমঝদারদের মধ্যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের গুণী মানুষেরা ছিলেন একেবারে প্রথম সারিতেই। আঠারো শতকের শেষের দিক থেকে দ্বারকানাথ ঠাকুরের আমলে শিল্পচর্চায় ক্রমশ এগিয়ে আসতে থাকেন এই পরিবারের বিভিন্ন সদস্য। তাঁরই পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশি-বিদেশি নানান শিল্পীদের দিয়ে পরিবারের লোকজনের বেশ কিছু

প্রতিকৃতি অঙ্কন করিয়েছিলেন। এঁর পরের প্রজন্মে গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রকলার প্রতি আগ্রহ তো সর্বজনবিদিত। গুণেন্দ্রনাথের এক পুত্র গগনেন্দ্রনাথও অনেকদিন ধরে ছবি আঁকা এবং ভাস্কর্যের প্রথাগত পাঠ নিয়েছিলেন হরিচরণ বসুর কাছে। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পচর্চার সমৃদ্ধ ইতিহাস নিয়ে পরবর্তী সময়ে রীতিমতো গবেষণাও হয়েছে দেশে-বিদেশে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এঁরই ছোটো ভাই। বাড়িতে ছোটো পিসিমার ঘরের পটের ছবি দেখে দেখে যাঁর মনে ছবি সম্পর্কে প্রথম অনুসন্ধিৎসা তৈরি হয়। এরপর একুশ বছর বয়সে চিত্রকলা নিয়ে পাকাপাকিভাবে বিদ্যা অর্জনের চেষ্টায় প্রাথমিকভাবে তিনি সাহায্য পান খ্যাতনামা দুজন ভিনদেশি শিল্পীর। সেইসময়ের আর্ট স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল ইতালির মানুষ ও. গিলার্ডি এবং ইংলন্ডের বিখ্যাত শিল্পী সি এল পামারের। এই ও. গিলার্ডি বা ওলিন্টো গিলার্ডি বিভিন্ন সমসাময়িক পত্রপত্রিকা তথা আজও ইন্টারনেটে 'ignorant to all the prejudices' এই বিশেষ অভিধায় ভূষিত। এই মানুষটি বিধিনিষেধের বাইরে গিয়ে বঙ্গভূমিতে তথা ভারতবর্ষে শুরু করেছিলেন ছবি আঁকার এবং আঁকা শেখানোর এক অভিনব প্রয়াস। আর্ট স্কুলের সহকারী অধ্যক্ষের পদে দীর্ঘ উনিশ বছর থেকে তিনি কলকাতায় ইয়োরোপীয় ধাঁচের চিত্রকলা ছড়িয়ে দিতেও অনেকটা সফল হন। শশীকুমার হেশ, রোহিণীকান্ত নাগ, ফণীন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ তাঁরই খ্যাতকীর্তি ছাত্র। ইনিই অবনীন্দ্রনাথকে যত্নে শিখিয়েছিলেন লাইন ড্রয়িং। গুরুর বাড়িতেই ছিল শেখার বন্দোবস্ত। অবনীন্দ্রনাথ নিজের স্মৃতিকথায় বলেছেন এক-একটি 'লেসন'-এর জন্য কুড়ি টাকা করে পারিশ্রমিক দিয়ে তিনি এঁর কাছে আঁকা শিখেছিলেন। ছয় মাসের বেশি এই শিক্ষাপদ্ধতিতে ছাত্রের মন না টিকলেও বিদেশি পদ্ধতিতে প্যাস্টেলের কাজ, প্রতিকৃতি অঙ্কন, তেলরঙে ছবি আঁকা- এই সমস্ত তিনি প্রথম শিখেছিলেন গিলার্ডির কাছ থেকেই। ওলিন্টো গিলার্ডি অবসর নেবার পর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরই কিন্তু ১৯০৫ সালে আর্ট স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপালের আসন অলংকৃত করেছিলেন। প্রথমদিকেই তাঁর আর-একজন শিক্ষাগুরু ছিলেন ইংল্যান্ড থেকে আসা বিখ্যাত শিল্পী চার্লস পামার। এই সাহেব কিন্তু আবার শিক্ষক হিসেবে ছিলেন ভীষণ কড়া। তিনি ছাত্র অবনকে কোনওভাবেই একচুল ফাঁকি দেবার সুযোগ দেননি। এঁর কাছে আঁকা শেখার সময়েই বিলিতি সাহেব-মেমদের মডেল করে প্রতিকৃতি আঁকা শিখেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শেখা হয় জলরঙের কাজও। শোনা যায় মানুষের শরীরের

অ্যানাটমি আঁকার কঠিন আদেশ দিয়ে একবার তিনি তাঁর এই ছাত্রের হাতে তুলে দিয়েছিলেন একটি মড়ার মাথা। প্রবল গা ঘিনঘিনে ভাব নিয়েও সে ছবি শেষ করেই বাড়ি ফেরেন অবনীন্দ্রনাথ। ফিরে কম্প দিয়ে জ্বর আসে তাঁর। এরপর বেশ কিছুদিন তিনি পামার সাহেবের কাছ থেকে গা-ঢাকা দিয়ে ছিলেন বলেও জনশ্রুতি রয়েছে। তবে ফের একসময় শুরু হয় ওঁর কাছে চিত্রশিক্ষা। প্রথম জীবনে পাওয়া ভিনদেশি এই দুজন শিক্ষকের অবদান আজীবন স্বীকার করেছেন শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যে বিশেষ মানুষটির কথা এবার এই পর্বে কিছু বিস্তারিতভাবে বলা প্রয়োজন, তিনি হলেন আর্নেস্ট বিনফিল্ড হ্যাভেল। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পীসত্তায় যাঁর প্রভাব হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। কাকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরামর্শে বৈষ্ণব পদাবলি অবলম্বনে 'কৃষ্ণলীলা'র এক মিনিয়েচার সিরিজ ১৮৯৫ সালে আঁকা শুরু করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই সিরিজ দেখবার সূত্রেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটে হ্যাভেলের। খেয়াল করা বড্ড দরকার যে, হ্যাভেল হলেন ব্যতিক্রমী সেইসব ভিনদেশি মানুষদের একজন যাঁরা ইয়োরোপীয় ধ্যানধারণা, সাহিত্য ও চিত্রকলার সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকৃত অবয়বকেও প্রত্যক্ষ করেছেন নিবিড় নিষ্ঠায়। চিত্রকলার প্রকৃত সমঝদার ছিলেন হ্যাভেল। তিনিই ভারতবর্ষে ইয়োরোপীয় ছাঁচের চিত্রকলার সম্প্রসারণের প্রচলিত স্রোতের বিপরীতে প্রাচ্যের চিত্ররীতির দিকে আলোকপাত করতে সচেষ্ট হন। সাউথ কেনসিংটন স্কুলের ছাত্র এই মানুষটি প্রথাগত পশ্চিমী ধারার চিত্রকলার খুঁটিনাটি জেনেও কিন্তু সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হতে পারেননি। প্রাচ্যধারার শিল্পরীতির প্রতি এঁর আগ্রহও ছিল যথেষ্টই। ফলে ভারতে আসার আগেই এদেশীয় শিল্পকলার খুঁটিনাটি বিবিধ উপায়ে হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করেছেন ইনি। এবং ১৮৮৪ থেকে বেশ কিছু বছর মাদ্রাজের গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ থাকাকালীন তাঁর এই অন্বেষণ পরিপুষ্টি লাভ করে। এরপর কলকাতায় এসে আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষের দায়িত্বভার গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ভারতীয় কলাশিল্পের বিকাশে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এই কাজে তাঁর সঙ্গী এবং শিষ্য ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। "...হ্যাভেল তাঁর সকল শক্তি নিয়োগ করেছিলেন ভারতীয় কলাশিল্পের স্বরূপকে সকলের কাছে, বিশেষ করে ইয়োরোপের কলা-রসিকদের কাছে স্পষ্ট করে তুলে বিশ্বের কলাশিল্পে তার বিশিষ্ট অবদানের গুরুত্ব প্রমাণ করতে। অবনীন্দ্রনাথের প্রয়াস ছিল আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে নতুন যুগের ভারতীয় কলাশিল্পকে প্রাচ্যমুখী করে তোলা এবং তার ভিত্তিতে, স্বকীয় চরিত্রে সেই

চিত্রকলার নানামুখী বিকাশ ঘটানো।... হ্যাভেলকে অবনীন্দ্রনাথ গুরু বলে মেনেছিলেন; হ্যাভেল তাঁকে গ্রহণ করেছেন সহযোগী হিসেবে; কখনও সস্নেহে বলেছেন 'চেলা'।"[২] হ্যাভেলের উদ্যোগেই ১৯০০ সালে গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের চিত্র-প্রদর্শনীতে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পদ্মাবতী', 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি' প্রভৃতি সিরিজের চিত্র তুলে ধরা হয় এবং তা প্রশংসিত হয়। এর কিছুদিনের মধ্যেই দিল্লি-দরবারের রাজকীয় প্রদর্শনীতে অবনীন্দ্রনাথের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে কাঠের পাটার উপর তেলরঙ দিয়ে আঁকা 'অন্তিমশয্যায় শাহজাহান' ছবিটির মাধ্যমে। এই স্বীকৃতি শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁকবদল হিসেবে আমরা ধরে নিতেই পারি। আর এই স্বীকৃতির নেপথ্যে হ্যাভেলের ভূমিকা অস্বীকার করবার কোনও উপায় নেই। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্র-আঙ্গিকে যে স্বকীয়তা, তা প্রাথমিক পরিচিতি পেয়েছে তাঁর আঁকা মুঘল আমলের ছবির মিনিয়েচার প্রতিলিপির মাধ্যমে। এইখানে হ্যাভেল এবং তাঁর আদর্শগত ঐক্য চোখে পড়তে বাধ্য। এবং এই দুজন শিল্পীই ভারতবর্ষের চিত্রশিল্পচর্চার মূল সুরটির অন্বেষণে রত থেকেছেন জীবনের একটা বড়ো সময়ে। ভিনদেশি মানুষ হলেও ই. বি. হ্যাভেলের নিষ্ঠা এই অন্বেষণে চোখে পড়বার মতন। কারুশিল্প এবং চারুশিল্পের দুই বিশেষ বিভাগ তিনিই চালু করেন আর্ট স্কুলের পাঠক্রমে। কিন্তু তাঁর উদ্যোগের জন্য তাঁকে সমালোচনার মুখেও পড়তে হয়েছে বারবার। এমনকি বাঙালি ছাত্রদের কাছ থেকেও একশো ভাগ সমর্থন তিনি কখনও পাননি। এই পর্বে তাঁর সহযোগী হয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এমনকি দেশে ফিরে যাবার পরও অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নতুন ধরনের চিত্ররীতি সম্পর্কে বারবার লেখালেখি করে গিয়েছেন ভিনদেশি এই মানুষটি। ১৯০৬ সাল থেকে হ্যাভেল দেশে ফিরে যাবার পরে প্রাচ্যের শিল্পচর্চার সমৃদ্ধি নিয়ে সাধনায় নিমগ্ন হন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিখ্যাত প্রাবন্ধিক অশোক ভট্টাচার্যের মতে- এর পরবর্তী অন্তত এক দশক বাংলার চিত্রকলা জগতের প্রধান পুরুষ ছিলেন তিনিই।

অবনীন্দ্রনাথের খ্যাতকীর্তি ছাত্রদের মধ্যেই ছিলেন নন্দলাল বসু, কে ভেঙ্কটাপ্পা, অসিতকুমার হালদার, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্রনাথ দে, হাকিম মহম্মদ খান প্রমুখ। এঁরা প্রায় সবাই একটা বড়ো সময় ধরে আর্ট স্কুলের ছাত্র হিসেবে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পেয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। অথচ চিত্রকলার শিক্ষা নিতে গিয়ে এঁদের গুরুর মতন সমস্যায় পড়তে হয়নি এঁদের কাউকেই। কারণ এঁরা প্রথমাবধিই হ্যাভেল এবং অবনীন্দ্রনাথ

ঠাকুর প্রবর্তিত, ভারতীয় উপাদানে পরিপুষ্ট একটি শিক্ষাক্রমের অংশ হতে পেরেছিলেন। আর্ট স্কুলের ঘরের সমস্ত দেওয়ালে তখন টাঙানো থাকত রাজপুত, তিব্বতি, মুঘল, পারসিক প্রভৃতি নানান ধরনের ছবি। পড়ানো হত পুরাণ, উপপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, অলংকারশাস্ত্র- এই সমস্ত কিছুর থেকেই। ফলে ছাত্রদের শিল্পীব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়ে ওঠার পথে এদেশি-বিদেশি ধাঁচের প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্ব ঘটার সুযোগ ছিল কম। কিন্তু স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্ষেত্রেই এই দ্বন্দ্ব ঘটে চলেছিল নিরন্তর। কিন্তু এই দোলাচলতাকেও ইতিবাচক ভঙ্গিমায় গ্রহণ করবার ফলেই হয়তো শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তুলির টানে এসে পড়েছিল বিশ্বজনীনতার প্রভাব। "আধুনিক ভারতশিল্পের রেনেসাঁ প্রথম আরম্ভ করেন অবনীবাবু। আরম্ভ করেন বঙ্গভঙ্গের সময়ে। তিনি বলতেন, আরম্ভের কারণটা অবশ্য বঙ্গভঙ্গ নয়।"[৩] বাস্তবিক, এই আরম্ভের কারণ মাত্র একটিই নয়, একের অধিক। সেই সময়ে বঙ্গভূমির নানান সামাজিক-রাজনৈতিক উত্থানপতন এই মানুষটিকে প্রভাবিত করেছিল তা অনস্বীকার্য। কিন্তু সেই সঙ্গেই তাঁর শিল্পী-মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল বিশেষ ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ একটি দেশের চিত্রকলাচর্চার ধরন। দেশটির নাম জাপান। সবার প্রথমে যে জাপানি শিল্পীর সান্নিধ্যে অবনীন্দ্রনাথ আসেন, তিনি হলেন ওকাকুরা কাকুজো। এই কীর্তিমান মানুষটি হলেন জাপানি শিল্পশাস্ত্রী এবং একইসঙ্গে জাপানি নবজাগরণের অন্যতম প্রধান পথিকৃৎও বটে। 'টোকিও চারুকলা ও সংগীত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়'-এর প্রথম ডিন ওকাকুরা কাকুজো জাপানি নন্দনতত্ত্ব নিয়ে নিয়মিত চর্চা করেছেন। তাঁর লেখা নানান (অধুনা দুষ্প্রাপ্য) গ্রন্থে তিনি বার্তা দিয়ে গিয়েছেন প্যান এশিয়ানিজম-এর। ইনি এদেশে প্রথমবার আসেন স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে পরিচিত হবার আশায়, ১৮৯৮ সালে। এদেশে আসবার পর তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে জগদীশচন্দ্র বসু, ভগিনী নিবেদিতা, বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের। এবং সেই সময়ের ব্রিটিশবিরোধী বাঙালি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তাঁর বিবিধ ভূমিকার কথাও আজ অনেকেই জানেন। ক্রমশ ঠাকুরবাড়ির বিদ্বজ্জনদের সঙ্গেও আলাপ হয় তাঁর। এই ওকাকুরাই কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে জাপানের চিত্ররীতির প্রথম সাক্ষাৎ ঘটান। তাঁর প্রদর্শিত পথ ধরেই এবার জাপানি ঢঙের ছবি আঁকা শিখতে শুরু করেন আর্ট স্কুলের ছাত্ররাও। আর অবনীন্দ্রনাথ এঁরই কাছ থেকে লাভ করেছেন মর্যাদায় পরিপূর্ণ অথচ সারল্যে ভরপুর জাপানি শিল্পবোধের আদর্শ।

"... বেঁটেখাটো মানুষটি, সুন্দর চেহারা, টানা চোখ, ধ্যাননিবিষ্ট গম্ভীর মূর্তি। বসে থাকতেন ঠিক যেন এক মহাপুরুষ, রাজভাব প্রকাশ পেত তাঁর চেহারায়।... নন্দলালদের তিনি তিনি আর্টের ট্র্যাডিশন, অবসার্ভেশন ও ওরিজিন্যালিটি বোঝাতেন তিনটি দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে।"[৪]

কাকুজো ওকাকুরাকে এইভাবে নিজের স্মৃতিকথায় বর্ণনা করে গিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন ওকাকুরা, এবং অনেকবারই তাঁর ভ্রমণের সঙ্গী হন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং। দুজনেরই উদ্দেশ্য ছিল শিল্পের সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ ভারতাত্মার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করা এবং পরবর্তী সময়ে তৎকালীন চিত্রশিল্পের চর্চায় সেই স্বরূপের উপাদান যথাসাধ্য মিশিয়ে দেওয়া। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্থাপিত বেঙ্গল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতে প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিলেন এই ওকাকুরাই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই মানুষটিকে কলাসৌন্দর্যের রসজ্ঞ বলে চিনে নিয়েছিলেন এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পসত্তাতে জাপানের চিত্রশৈলীকে চিরতরে বুনে দিয়ে গিয়েছিলেন কাকুজো ওকাকুরা। তাঁর আগ্রহেই জাপান থেকে এরপর কয়েকজন বিখ্যাত আঁকিয়ে এসে পৌঁছোন ঠাকুর পরিবারের সান্নিধ্যে। চিন এবং জাপানের চিত্ররীতি এবং ক্যালিগ্রাফির গভীর প্রভাব এরপর বাঙালি শিল্পীদের মধ্যেও পড়েছিল। ফলে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে জাপানি চিত্রকরদের যোগাযোগ এই পর্বে যথেষ্ট গুরুত্বের দাবি রাখে।

দেশে ফিরে গিয়ে ওকাকুরা কাকুজো যে-সমস্ত জাপানি শিল্পীদের ভারতবর্ষে পাঠান তাঁদের মধ্যে বিশেষ দুজনকে বারবার স্মরণ করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এঁরা হলেন ইয়োকোহামা টাইকান এবং হিসিদা সুনশো। এই দুজন জাপানি চিত্রকর ভারতবর্ষে আসেন ১৯০৩ সালে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এই দুজনেরই প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে এবং তাঁর ছাত্ররা এঁদের কাছেই শিখেছিলেন জাপানি ওয়াশ পদ্ধতির আঁকা। এঁদের মধ্যে টাইকান আবার অনেক ভারতীয় বিষয়েও ছবি এঁকে গিয়েছিলেন। তাঁর 'রাসলীলার নৃত্য' ছবিটি অবনীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণাতেই আঁকা। পরবর্তী সময়ে এক জাপানি শিল্পপতি পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে এই ছবিটি কিনে নেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই টাইকানের কাছে ছবি আঁকার বিশেষ রীতির পাঠ নিয়েছিলেন বেশ অনেকদিন।

"...টাইকান আমায় লাইন ড্রয়িং শেখাত, কী করে তুলি টানতে হয়।

আমরা তাড়াতাড়ি লাইন টেনে দিই- তাঁর কাছেই শিখলুম একটি লাইন কত ধীরে ধীরে টানে তারা। আমার কাছেও সে শিখত মোগল ছবির নানান টেকনিক।... টাইকানের ছবি আঁকা দেখেই একদিন আমার মাথায় এল, জলে কাগজ ভিজিয়ে ছবি আঁকলে হয়। টাইকানকে দেখতুম ছবিতে খুব করে জলের ওয়াশ দিয়ে ভিজিয়ে নিত। আমি আমার ছবিসুদ্ধ কাগজ দিলুম জলে ডুবিয়ে। তুলে দেখি বেশ সুন্দর একটা এফেক্ট হয়েছে। সেই থেকে ওয়াশ প্রচলিত হল।"[৫]

এই ওয়াশ পদ্ধতির আঁকা কিন্তু জাপানে আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। এইবার তা এসে মিশলো বাঙালি ধাঁচের ছবি আঁকার স্রোতে। জাপানে ফিরে যাবার পর শিল্পী হিসেবে স্বয়ং জাপানের রাজার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন এই ইয়োকোহামা টাইকান। আরেকজন ছিলেন হিসিদা সুনশো। এই শিল্পী মানুষটি স্বভাবেও ছিলেন ভাবুক প্রকৃতির। অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায় তিনি উল্লেখ করে গিয়েছিলেন যে অল্প বয়সে জীবনাবসান না হলে দেশে-বিদেশে খ্যাতি পেতে পারতেন এই হিসিদা। ছবি আঁকার জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম না করে যেন প্রকৃতিকে আবিষ্ট হয়ে নিরীক্ষণ করাতেই ছিল তাঁর আনন্দ। এই মানুষটি তাঁর আঁকা অসংখ্য বেড়ালের ছবির জন্য স্মরণীয় হয়ে রয়ে গিয়েছেন। তবে প্রকৃতিগত ভাবে ভাবুক বা উদাসীন এক শিল্পী হলেও জলরং, তেলরং, ফ্রেস্কো, ওয়াশ, লাইন ড্রয়িং প্রভৃতি নানান মাধ্যম ও প্রকরণে রীতিমতো পারদর্শী ছিলেন হিসিদা। বেঙ্গল স্কুল- ঘরানায় ছবি আঁকার যে নবজাগরণ ঘটে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে, তাতে টাইকানের সঙ্গে সঙ্গে হিসিদার অবদানও কিছু কম নয়। তাঁর আঁকা 'কালো বিড়াল' ছবিটি অনেক পরে জাপানের সরকার পোস্টাল স্ট্যাম্পে ব্যবহার করা শুরু করে।

জাপানি আর-একজন শিল্পীর কাছে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেশ কিছুদিন আঁকার নানান টেকনিক শিখেছেন। ইনি হলেন কাৎসুতা শ্যোকিন বা নামান্তরে কাৎসুতা যোশিও। টোকিও আর্ট স্কুল থেকে সদ্য পাশ-করা এই তরুণ চিত্রশিল্পী কলকাতায় ছিলেন দুই বছরের অল্প কিছু বেশি সময়। কলকাতার গভর্নমেন্ট স্কুল অফ আর্টেও অনেকটা সময় শিক্ষকতা করেন ইনি। এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম প্রথাগত জাপানি শিক্ষক ছিলেন কাৎসুতাই। তাঁর আঁকায় অনেকেই অবনীন্দ্রনাথের প্রভাব দেখতে পান। বাস্তবিক, কাৎসুতা যখন এদেশে আসেন এবং চিত্রকলার চর্চা নিয়মিত করতে থাকেন, হ্যাভেল-উত্তর সেই সময়ে বাংলাদেশের ছবি আঁকার জগতের প্রধান পুরুষ অবিসংবাদিতভাবে

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরই বটে। তাঁর সাহচর্যেই নতুন ওরিয়েন্টাল স্টাইলে রাম, সীতা, লক্ষণ প্রমুখের ছবি এঁকে গিয়েছিলেন কাৎসুতা। এবং ওকাকুরার উত্তরসূরি হিসেবে ইন্দো-জাপান শৈল্পিক মেলবন্ধনকে এই মানুষটি আরও দৃঢ় গ্রন্থিতে বেঁধে দিতে পেরেছিলেন। আরও আশ্চর্য হতে হয় জানলে যে, হ্যাভেল এবং অবনীন্দ্রনাথ প্রাচ্যশিল্পের যে ধনাঢ্য ইতিহাসকে চর্চায় ও চিত্রকলার তুলে আনতে সচেষ্ট ছিলেন, কাৎসুতাও ছিলেন ওই একই সাধনায় রত। হ্যাভেল, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কাৎসুতা মিলে গভর্নমেন্ট স্কুল অফ আর্টের পাঠক্রমে ব্যতিক্রমী বিবর্তন আনবার প্রয়াস করেছিলেন। সারা ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে এই মানুষটি এদেশের সংস্কৃতিকে যথাসাধ্য উপলব্ধির চেষ্টা করেন। বৌদ্ধ ধর্মীয় নানান বিষয়ের উপর তাঁর আগ্রহ ছিল চোখে পড়বার মতন। এবং এই বিষয়ে ছবি আঁকার সময়ে তিনি অনেকটা অনুসরণ করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে।

> "...Even in depicting a Buddhist subject, there is evidence that Shokin learned from Abanindranath's works... Shokin inherited the connection between Ababnindranath and Shunso, and executed the same subject in his newly learned Indian style." [৬]

তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে কলকাতায় বসে আঁকা তাঁর অনেকগুলি ছবি নষ্ট হয়ে গিয়েছে উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে।

যাঁদের বিশেষ উল্লেখ এই নিবন্ধে রয়েছে, এঁরা ছাড়াও শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এমন অনেক ভিনদেশি মানুষের সাহচর্যই লাভ করেছিলেন যাঁরা তাঁকে তাঁর অভীষ্ট পথে এগিয়ে যেতে সহায়ক হয়েছিলেন কোনও না কোনও ভাবে। যেমন ভগিনী নিবেদিতার প্রত্যক্ষ প্রভাব তাঁর আঁকা একাধিক ছবিতে আমাদের চোখে পড়বে। এই শ্বেতাঙ্গী শুভ্রবসনা সন্ন্যাসিনী যেন সরস্বতীর রূপ ধরে তাঁর তুলিতে প্রাণ পেয়েছেন। এবং অবশ্যই এ কথা ভুললে চলবে না যে, বিদেশে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবির প্রচারে এবং তৎকালীন ইয়োরোপীয় বিদগ্ধজনের মাঝে শিল্পী অবনীন্দ্রনাথকে বিশেষ আসন দিতে অন্যতম প্রধান সহায় ছিলেন এই নিবেদিতাই। এছাড়াও আর্ট স্কুলে আসা তিব্বতি লামা, ভিনদেশি কাবুলিওয়ালা, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মহিলা, ব্রিটিশ শিল্পী পার্সি ব্রাউন, উইলিয়াম রোদেনস্টাইন, ফরাসি ভাষার শিক্ষক হ্যামারগ্রেন, নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচিত বিলিতি মেমসাহেব, ল্যান্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের উডরফ ব্লান্ট, থর্নটন, মাদাম টোন, লেডি হ্যারিংহ্যাম এঁরা সবাই তাঁর চিত্রকর সত্তাটিতে কোনও না কোনওভাবে

ছাপ ফেলে গিয়েছেন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, তা বলা বাহুল্য মাত্র। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের অনেকখানি অংশ জুড়ে রয়ে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ফলে তাঁর পরিচিত ভিনদেশি মানুষদের অনেকের সঙ্গেই হৃদ্যতা জন্মে গিয়েছিল ভাইপো অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও। যা ক্রমশ তাঁর প্রবর্তিত বেঙ্গল স্কুল রীতির চিত্রচর্চায় প্রভাব ফেলেছে। সারা বিশ্বের নানান দেশের বিবিধ ধারার চিত্ররীতির সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল তাঁর। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিরলস ভাবে শিখেওছিলেন নানান বিদেশি টেকনিক। আশ্চর্যজনকভাবে, তবুও তাঁর তুলির টানে, হাতের কাজে রয়েছে এই দেশেরই মাটির রং। ভারতশিল্পী হিসেবে তিনি চ্যুত হননি কোথাও।

> "...অবনীন্দ্রনাথের ভারতশিল্পে অবয়বে ও বিষয়ে আমরা ভারতের এক সুস্পষ্ট জাতীয়তাবাদী পরিচিতি পেয়ে যাই। তাঁর ছবি দেখলেই আমরা চিনে যাই এ ছবি ভারতীয়।... দ্বিমাত্রিক ও রেখাভিত্তিক অবয়ব এবং বিষয়ের ভারতীয়তা তাঁর ভারতশিল্পের মূল আবেদন,... ছবির সঙ্গে ছবির বাইরে সারা দেশের ভাবগত বাস্তবতার গভীর সম্পর্ক ছিল। তাই তাঁর চিত্রকলায় ছিল বিশিষ্ট ফর্ম, স্টাইল ছাড়াও ভারতীয়ভাবে আপ্লুত এক ঋদ্ধ বিষয় বা কনটেন্ট।"[৭]

ব্যতিক্রমী কনটেন্ট তৈরির রাজা ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই ব্যতিক্রম তাঁর সাহিত্যচর্চায় যেমন ভেসে উঠেছে, তেমনই বিচ্ছুরিত হয়েছে কলাশিল্পের দর্পণেও। এবং এ নিবন্ধের সূচনাতেই উল্লেখ করা রয়েছে যে শেখার কিংবা শেখানোর ক্ষেত্রে তিনি বাঁধাধরা গৎ মানেননি কখনও। ফলে গণ্ডির বাইরে গিয়ে শিল্পের জগতকে চিনেছেন যাঁরা, শিক্ষালাভের জন্যেও তাঁদেরই সান্নিধ্য গ্রহণ করেছেন তিনি। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে গিলার্ডি ও পামারকে বাদ দিলে তাঁর উত্তরজীবনের ভিনদেশি শিক্ষকদের অধিকাংশের সঙ্গেই অবনীন্দ্রনাথের গুরু-শিষ্য সম্পর্কটি ছিল এক উভমুখী মিথস্ক্রিয়ার; একইসঙ্গে শিখনের এবং শিক্ষণের। প্রকৃতপক্ষে যে কোনও শিক্ষণপর্বই সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পারস্পরিক আদানপ্রদানের ফলেই। বিদেশি চিত্রশিল্পীদের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের যোগাযোগ বস্তুত তাঁরই এক উজ্জ্বল উদাহরণ। তাঁর শিল্পসন্ধানের অভিযাত্রায় যেসব বিদেশি মানুষজনকে তিনি পথে পেয়েছেন, তাঁদের সবার কাছ থেকে পাওয়া ছবি আঁকা বা হাতের কাজের বিশেষ বিশেষ মুনশিয়ানা মিলিয়ে মিশিয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি তৈরি করতে পেরেছেন প্রাচ্যের তথা ভারতীয় আর্টের নতুন

এক কাঠামো। যে কাঠামোয় পরবর্তী সময়ের ভারতীয় শিল্পসাধকরা প্রলেপ দিয়েছেন নিজের নিজের সাধ্যমতন খড়-মাটির, যা আজকের ভারতশিল্পকে বিশেষ এক সমৃদ্ধি প্রদান করেছে।

তথ্যসূত্র

১। ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, 'প্রিয়দর্শিকা'(পুনর্মুদ্রণ), বৈশাখী, সংখ্যা ২২, পৃঃ-৮৯, ২০১২-১৩, ধ্রুবজ্যোতি মণ্ডল সম্পাদিত, কলকাতা।

২। ভট্টাচার্য, অশোক, বাংলার চিত্রকলা, পৃঃ- ১২১-১২২, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৪।

৩। বসু, শ্রীনন্দলাল, 'ভারতশিল্পে নবযুগের ভূমিকায় অবনীন্দ্রনাথ', পশ্চিমবঙ্গ, অবনীন্দ্র সংখ্যা, বর্ষ ১৪০২, তরুণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলকাতা।

৪। ঠাকুর, শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ, চন্দ, শ্রীরানী, জোড়াসাঁকোর ধারে, পৃঃ-১০৬-১০৭, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৪৪।

৫। তদেব, পৃঃ- ১০৪।

৬। Igarashi, Masumi, Katsuta Shokin: A Japanese Painter at the Government School Of Art, Calcutta, 1905-1907, INDIA-JAPAN NARRATIVES: Lesser Known Historical & Cultural Interactions, ed. Sushila Narsimhan, ISBN-978895255603, Page-13-14, Okayama University, Okayama.

৭। মজুমদার, মনসিজ, 'আর্টের নতুন রাস্তা', দেশ, পৃঃ-৩১, সুমন সেনগুপ্ত সম্পাদিত, কলকাতা, ২রা আগস্ট, ২০২১।